Vol. 51 | No. 3 | 2014

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

অনিলার পিতৃক্ষুধা

Volume	51
Issue	3
Year	2014
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	শোয়াইব জিবরান
Published online	June 1, 2014
DOI	10.62328/sp.v51i3.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v51i3.2
Pages	২৯-৩৭
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

অনিলার পিতৃক্ষুধা

Check for updates

শোয়াইব জিবরান*

কমলকুমার মজুমদার (১৯১৪-১৯৭)-এর *অনিলা স্মরণে* উপন্যাসটি গড়ে উঠেছে অনিলা চরিত্রকে কেন্দ্র করে, আরো সুনির্দিষ্টভাবে বললে, অনিলার পিতৃক্ষুধা (Father hunger)[১] কে কেন্দ্র করে। পিতৃক্ষুধা নিয়ে এ উপন্যাস রচনাকালে জ্ঞানজগত ছিল ফ্রয়েড-গুস্তাভবাদে আবর্তিত। সেখানে পিতৃকূটৈষা (Father complex) কে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যৌনচেতনার অনুষঙ্গে। আর তার সূত্র অনুসন্ধান করা হয়েছে পুরাণে। ফলে কন্যা-পিতার সম্পর্ককে বর্ণনা করা হয়েছে ইলেকট্রা কূটৈষা (Electra complex) হিসাবে। কিন্তু কমলকুমারের *অনিলা স্মরণে* উপন্যাসের পিতা-কন্যা সম্পর্ক আশ্চর্যজনকভাবে স্বতন্ত্র আর প্রাগ্রসর চিন্তা-চেতনাবাহী। বর্তমান প্রবন্ধে *অনিলা স্মরণের* অনিলা চরিত্র বিশ্লেষণসূত্রে তার পিতৃক্ষুধার স্বরূপ আলোচনা করা হবে এবং সে সূত্রে এ মানবীয় সর্ম্পকের পরিণতি তুলে ধরা হবে।

উত্তর আধুনিক কালখণ্ডে পিতার মৃত্যু[২] (*Death of The Author*) ঘটেছে । কিন্তু বিগত শতাব্দীর প্রথমার্ধে কমলকুমারের জীবনকাল ছিল পিতাময়। শৈশবে মায়ের পাশে বসে শুনেছেন গীতার জগতপিতার বাণী, টোলে মাথা ন্যাড়া করে অধ্যয়ন করেছেন জগতপিতার মন্ত্র, তারও পরে ভর্তি হয়েছেন খ্রিষ্টান মিশনারি স্কুলে। ফাদারের চ্যাপলে চড়ে শুনেছেন খ্রিষ্টীয় জগতপিতা ও তার পুত্র যিশুর গসপেলরাশি। বাসগৃহে তীব্রভাবে লক্ষ করেছেন পুলিশ পিতার উপস্থিতি। কিন্তু পরবর্তী জীবনে নিজে বঞ্চিত হয়েছেন পিতৃত্বের স্বাদ থেকে। লেখকের মনে তৈরি হয়েছিল এক মানবীয় সংকটধারী পিতৃক্ষুধা। ফলে তিনি তরুণ তরুণতর কবিদের মাঝে খুঁজেছিলেন পুত্রের প্রতিমা (জিবরান, ২০০৯)।

কমলকুমারের পিতৃত্ব আকাঙ্ক্ষার প্রথম অভিক্ষেপ আমরা লক্ষ করি 'লাল জুতো' (১৩৪৪) গল্পে। যেখানে একটি অপরিণত যুবক নিতিন তার প্রেমিকাকে উপহার দিতে গিয়ে উপহার দেয় শিশুর পায়ের উপযোগী একজোড়া লাল জুতো। অথচ তখনো তাদের বিয়ে সুদূরপরাহত। পিতা-পুত্রের সম্পর্ক আরো গভীরভাবে অঙ্কিত হয় 'তাঁহাদের কথা' (১৩৬৫) ছোটগল্পে। *শ্যাম-নৌকায়* (১৩৭১) পিতার প্রতি তীব্র ভালোবাসা ও *সুহাসিনীর পমেটমে* (১৯৬৫) লখাইয়ের পিতৃপরিচয়হীনতার সংকট ক্ষুদ্র পরিসরে চিত্রিত হলেও পিতৃক্ষুধার বিস্তৃত আখ্যান পাই আমরা *অনিলা স্মরণে* উপন্যাসেই।

২

অনিলা স্মরণে উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৭১ সালে 'দর্পণ' শারদীয় সংখ্যায়। পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় কমলকুমারের মৃত্যুর (১৯৭৯) পর ১৯৮৪ সালে বইমেলায়। একই

*অধ্যাপক, বাংলা, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

বৎসর মৃত্যুপথযাত্রী এক পিতার প্রতি পুত্রের ভালোবাসাকে কেন্দ্র করে রচিত উপন্যাস *শ্যামনৌকা* ও প্রকাশিত হয় 'এক্ষণ' বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়। আমরা জানি, কমলকুমারের কথাসাহিত্য থিম নির্ভর (জিবরান, ২০০৯)। ভক্তি ও বাৎসল্যরসই এ দুটো উপন্যাসের ভিত্তি। সাহিত্যের ভূমিকা সম্পর্কে কমলকুমারকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছিলেন —

> ভূমিকা আছে। স্নেহ কথাটাকে রেখে যাব, আমরা প্রেম কথাটাকে রেখে যাব। আমরা শ্রদ্ধা কথাটাকে বাঁচিয়ে যাব। ... আমরা সাহিত্যে কী করি? আমরা কতকগুলো সুন্দর কথা কতকগুলো সুন্দর ভক্তিরস এই কথাগুলো যেমন ছেলেবেলাতে দেখলাম ওয়র এন্ড পীস। তেমনটি কোনো বইয়ে ভক্তির কথা, পিতৃস্নেহ, মাতৃস্নেহ, এটাতে স্ত্রীর ক্যারাকটার খুব চমৎকার রয়েছে অর্থাৎ এ রকম হওয়া উচিত। (কমলকুমার, ১৯৯৭ : ৪১)

অনিলা স্মরণে উপন্যাসে আছে খ্রিষ্টবিশ্বাসী পিতৃঅন্তপ্রাণ এক কন্যা ও তার মাতা। এ মাতা কন্যার মাঝখানে রয়েছেন এক অনুপস্থিত পিতা (Absent father)। এ ত্রয়ী চরিত্রের দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে উপন্যাসটি। সাহিত্যে কন্যা-মাতার সম্পর্ককে কেন্দ্র করে রয়েছে নানা আখ্যান। বাস্তব জগতেও রয়েছে কন্যা-মাতার সম্পকের নানা বয়ান।

> Mothers and daughters "co-author" each other's life stories, discursively creating the realities of their worlds and their relationships. They are often highly involved in each other's lives, communicating frequently about both significant and mundane events. In discussing everyday stressors, mothers and daughters often share stories of their experiences with each other. (Haley Kranstuber Horstman, 2012 : 1)

অনিলা স্মরণে উপন্যাসের মাতা কন্যার সংলাপ ও দ্বন্দ্বটি গড়ে উঠেছে অনুপস্থিত পিতাকে কেন্দ্র করে। পিতৃক্ষুধাতত্ত্বে যেমনটি বলা হয়েছে পিতার অনুপস্থিতি (Absent father) কন্যার আচরণকে অসংলগ্ন করে তোলে তেমনি আমরা এ উপন্যাসে দেখতে পাই পিতার অবর্তমানে কন্যা সকল স্বাভাবিকতাই হারিয়েছে। অবশ্য এটি হঠাৎ করেই ঘটেনি। ঘটেছে স্তরে স্তরে নানা ঘাত প্রতিঘাতের ভেতর দিয়ে।

উপন্যাসে অনিলার প্রবেশ ঘটে মা লাবণ্য দেবীর স্মৃতিসূত্রে। উপন্যাসের শুরুতে আমরা দেখতে পাই মাতা লাবণ্য দেবী কন্যার আগমনের অপেক্ষায় হাওড়া স্টেশনে অপেক্ষ্যমান। কন্যাটি দীর্ঘদিন পর মিশনারি স্কুলের বর্ডিং থেকে বাড়ি ফিরছে। ততোদিনে তার পিতার মৃত্যু ঘটেছে মাতা আরেকটি বিয়ে করেছেন। কিন্তু মাতার এ তড়িঘড়ি বিয়ের তথ্য মেয়ে অনিলা জানে না। যেমন জানে না তার পিতার মৃত্যুর প্রকৃত কারণ। অবশ্য আমরা পাঠকরাও জানি না বা পুরো উপন্যাসটি পড়ে শেষ করেও নিশ্চিত হতে পারি না ঠিক কীভাবে অনিলার পিতা মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তাকে কি হত্যা করা হয়েছিল? রঞ্জিত, লাবণ্য দেবীর নতুন স্বামী কি এর সাথে কোনোভাবে জড়িত ছিলেন — লেখক পুরো উপন্যাসে আমাদের 'তুমি আমার বাবাকে হত্যা করেছো' — অনিলার এ অভিযোগের সামনে ধুঁয়াশার ভেতর রাখেন। অনিলার পিতা মৃত্যুবরণ করেও তাদের বাস্তব জীবন থেকে যেমন তেমনি উপন্যাসেও অনুপস্থিত থেকেও উপস্থিত থাকেন। এই অনুপস্থিত-উপস্থিত চরিত্রসূত্রে গবেষক এ উপন্যাসটিকে সম্পর্কিত করেন ফরাশি নতুন নভেল আন্দোলনের পুরোধা নাতালী সারোতের *পোট্রেট অব*

আননোন (১৯৪৮) উপন্যাসের নব বিবাহিত দম্পতির মাঝখানে রহস্যজনকভাবে একটি দেয়ালে টাঙানো ছবির উপস্থিতির সঙ্গে। (হিরন্ময়, ১৯৯০ : ১০৭)।

লাবণ্য দেবী তার পূর্ব স্বামীর মৃত্যুও জন্য দায়ী কিনা আমরা নিশ্চিত না হলেও তার পাপবোধটি আমরা লক্ষ করি। তিনি পিতাহীনা অনিলার জন্য যখন স্টেশনে আসার অপেক্ষা করেন তখন গভীরতর পাপবোধে আক্রান্ত হন। তার পাপবোধটি কি বিবাহজনিত? আমরা নিশ্চিত নই। তবে দেখি লাবণ্য দেবী 'যিনি নিরবধি কাল অনুভবে আবেগের মধ্যে ছোট'—

> লাবণ্য দেবী, যিনি নিরবধি কাল অনুভবে আবেগের মধ্যে ছোট ; আর নানান দিনের কথায় উদভ্রান্ত, তিনি- তাঁহার এখনকার অস্তিত্বের কিছু স্মরণে ছিল না, তীব্র নখিলা আওয়াজে হঠাৎ সম্বিত ফিরিয়া পাইলেন, অতীব দ্রুত, সত্বও দেহের এখানে সেখানে হস্তদ্বারা স্পর্শ করিতে ব্যগ্র, ইতিমধ্যে একদা তাহার নিতান্ত অপরিচিতির মতই মনে হইল, এ বেদনা কোন যন্ত্রণা-সম্ভব? (কমলকুমার, ১৯৮৪ : ৮-৯)

লাবণ্য দেবী তার আগে স্টেশনে বসে সারাক্ষণই একটি নির্ভরতা খুঁজেছেন। এই নির্ভরতা খোঁজতে গিয়ে তিনি মেয়ের শৈশবস্মৃতির মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করতে চেয়েছেন। শিশু হিসেবে মায়ের স্তন্যপান করা, টাবে স্নান করা ইত্যাদি নানা অনুসঙ্গে তিনি মেয়ের সাথে নিজের সম্পর্ককে মানসিকভাবে স্থাপন করতে চেয়েছেন। কিন্তু মেয়ে যখন সশরীরে ট্রেন থেকে নেমেছে তখন সে আর সেই ছোট্ট শিশুটি নেই। বারো বৎসরের কিশোরী। অনিলা স্টেশনে পৌঁছানোর পর লাবণ্য দেবীর দৃষ্টিকোণে লেখকের বর্ণনা —

> অনিলা তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল ; তাহার সৌন্দর্য্য দর্শনে লাবণ্য দেবী নমনীয় ; হয়ত একই সঙ্গে, খুসী এবং ভীত দুইই তাঁহার মধ্যে সঞ্চারিত হয়। অদূরে শুভ্র পোশাক পরিহিতা, মস্তকে সাদা বনেট, একটি আবাল্য কৃচ্ছ্রসাধনে প্রশান্ত মুখমণ্ডলের নিম্নে স্থির হইতে চাহে, ইহা তাঁহাকে, লাবণ্য দেবীকে স্পর্শ করে, এবং তিনি আপনার কণ্ঠে আঙুলের চাপ দিলেন। এ কারণে যে এ ক্রুশের পাশেই আর একটি সম্ভ্রান্ত অনির্ব্বচনীয় মুখমণ্ডল ছিল, যাহার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করার ইহা প্রস্তুতিমাত্র। (কমলকুমার, ১৯৮৪ : ২৩)

উপন্যাসের প্রথমার্ধে মা মেয়ের সম্পর্ক পরস্পর নির্ভরতার। হরস্টমেন-এর ভাষায় তারা — Mothers and daughters "co-author" each other's life stories (Haley Kranstuber Horstman, 2012 : 1)। ফলে মেয়ে হোস্টেল থেকে যখন মাকে তাঁর পিতৃক্ষুধার কথা জানিয়েছে মা এটাকে স্নেহের সাথেই নিয়েছেন। অনিলা পিতৃক্ষুধা সম্পর্কে চিঠিতে লিখেছে —

> "আমার বাবার কথা সব সময় মনে পড়ে।"
> "মাদাম সুপ্যেরিয়রের কাছে যাই, তিনি জানো আমাকে বলেন, শোক (দুঃখ) তোমাকে ঠিক রাস্তা এনে দেবে, বাবাকে সমস্ত সময় মনে রেখো ক্রমে তুমি উপলব্ধি করবে তাঁকে তিনিই মোক্ষ (!) দেবেন।"
> "জানো মা স্বপ্নের মধ্যে আমি বাবাকে ডেকে উঠি – আমার মোটে ভয় করে না, আমি জানালায় দাঁড়াই, কোয়াডর‍্যাঙ্গলের ওদিকে ক্লাইষ্টারের আর্কগুলি দেখে অন্য মেয়েরা ভয় পায় – আমার ভাল লাগে, ওখানকার অন্ধকার নরম শান্ত সুখকর।"

> "বাবাকে আমি জীবনে ভুলতে পারবো যদি কখনও ভুলি আমি, মা, ও মা আমি ভাবতে পারি না– তার আগে যেন মরে যাই, তুমি আমাকে ভুলতে দিও না।" (কমলকুমার, ১৯৮৪ : ১৪-১৫)

নানা সময়ে মাকে লেখা মেয়ের এই পিতৃক্ষুধার আকুতিভরা পত্রগুলো মায়ের মনকে অবশ করে দিয়েছে কিন্তু তিনি ভয় পাননি। কিন্তু অনেকদিন পর যখন কন্যার লকেটে মৃত স্বামীর ছবি দেখেছেন তখন ভূতগ্রস্ত বোধ করেছেন—

> অনিলা সুন্দর করিয়া বলিল- "দেখ মা-"
> লাবণ্য দেবী মুখ কেমন ভূতগ্রস্ত, চক্ষু দুটিতে কর্কশ আওয়াজ, তিনি নিজেই, চিত্রের মানুষটিকে এক ভয়ঙ্কর রমণীসুলভ হুঙ্কারে বিদ্রাবিত করিবার মানসে মুখ, মনে হয় ব্যাদান করিতে উন্মাদ। তবু রমণী আপনাকে ঝটিতি সম্বরণ করিয়াছিলেন, এবং ম্লানভাবে হাসিয়া, নিজের এই উন্মাদনার কথা ভ্রুকুঞ্চিত করত ভাবিতে ভাবিতে, ধীরে প্রকাশ করিলেন "বেচারী" বলিয়া তখনই যুক্তিপূর্ণ মনে আপনার এ হেন অশ্লীলতা বিষয়ে ভাবিয়া শঙ্কিত হইয়াছিলেন। কেননা, ঘুমের মধ্যে তিনি জাগিয়া থাকিতে আগ্রহান্বিত। পুনর্ব্বার স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বলিয়াছিলেন "ওনিলা ডিআ"। (কমলকুমার, ১৯৮৪: ২৬)

হারানো পিতাকে নিয়ে অনিলার যে অনুভূতি রয়েছে তার সাথে লাবণ্যদেবীর অনুভূতির যথেষ্ট ফারাক রয়েছে। তথাপি কন্যার সাথে মাতা স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এ চেষ্টা বেশি স্থায়ী হয়নি। তারা যখন এমলিওয়ার্থ হোটেলে পৌঁছেছেন তখন এটি লাবণ্যদেবীর কাছে আর সহ্য হয়নি। কেননা, অনিলা হোটেলে তার মৃত বাবার উপস্থিতির কথা বলেছে। ফলে লাবণ্য দেবীর কাছেও যেন মৃত স্বামী গঙ্গাকিশোর পুনরায় দেখা দিয়েছেন। এতে লাবণ্য দেবী ভীষণ উদ্বিগ্ন বোধ করেছেন। মেয়ের এ অবস্থা পরিবর্তনের জন্য পরিচিত লেডি মধুমণি ও মিসেস মিটারের সাথে আলাপ করেছেন। তারা অনিলাকে মানসিক রোগী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এবং তার মন অন্যদিকে ফেরানোর জন্য অনিলার প্রিয় ঘোড়দৌড়ের আয়োজন করতে পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু এ ঘোড়দৌড়ের আয়োজন করতে গিয়েই মূল বিপত্তি ঘটে। লাবণ্য দেবী তার রঞ্জিত চ্যাটার্জ্জিকে বিয়ে করার ঘোষণা-মঞ্চ হিসেবে এ সময়টিকে বেছে নেন। তিনি কন্যার কাছে তার বিবাহ সংবাদটি দেয়ার পর কন্যার প্রতিক্রিয়াটি হয় মারাত্মক। মা-মেয়ে যখন পরস্পর ঘোড়ায় সমতালে দৌড়রত তখন মা তার বিবাহ সংবাদটি ঘোষণা করেন। সে পরিপ্রেক্ষিত সৃজনে এবং পরিচর্যায় (Treatment) কমলকুমারের মুন্সিয়ানা আশ্চর্য শিল্পকুশল —

> লাবণ্য দেবী অসম্ভব দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছেন, কেননা ইহাই সেই স্পিড, যেখানে কোন ভয় নাই, আপনার মুখখানি বাঁকাইয়া কহিলেন, "অনিলা আমি বিয়ে করেছি।"
> অনিলা ইহার উত্তরে কহিল, "ঠিক আছে।"
> লাবণ্য দেবী এহেন উত্তর আশা করেন নাই, হতচকিত হইয়া পুনরায় কহিলেন, "অনিলা আমি বিয়ে করেছি।"
> অনিলা "কি" বলিয়া হঠাৎ ঘোড়া থামাইল, ঘোড়া তখনও ইষৎ ঘুরিতেছে।
> লাবণ্য দেবী কাতর নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া অবনত মস্তকে কহিলেন, "ওনিল আমি বিয়ে করেছি।"
> অনিলার মার পিছনে সমগ্র কলিকাতার শহর, ওপাশে- কাহারা অদ্ভুত জারসী পরিয়া কি যেন খেলা করে, পাখি সন্ধানী দূরবীণ হাতে ঘুরে সবকিছু দেখিল, মার মুখখানি কালো, অনিলা

অট্টহাস্য করিয়া উঠিল, অনেক দূরের কেল্লার তোপ-মিনারসহ তাহার ছবি লাল সূর্য্যালোকে বীভৎস হইয়া উঠিল, এবং সজোরে সে ঘোড়াকে চাবুক মারে, ঘোড়া এখানে রাস্তা পার হইয়া দুরন্ত বেগে ছুটিল, অনিলার চোখে জল ছিল না "বাবা ... বাবা" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল ... বেচারী এসময় তাহার হাতে লকেট কিছুক্ষণের জন্য ছিল, হঠাৎ রেকাব হইতে পা ছাড়িয়া অনিলা মাটিতে পড়িল, মুখময় হাতে জামায় ভিজা ঘাস, মুখ ঘসিয়া গিয়াছে চৌরঙ্গীর এপাশে, জলসত্র ছিল, অনিলা সেখানে গিয়া চোখেমুখে জল দিতে কিছু পাতা মুখে লাগিল, এখানে সে বসিয়া পড়িল, নিজে একদা প্রশ্নও করিল, কেন সে কাঁদছে? এতদিন পরে কেমন যেন সে অসহায়; (কমলকুমার, ১৯৮৪ : ৮৬-৮৭)

মায়ের এই বিবাহ সংবাদ অনিলাকে শেকড় থেকে উন্মুলিত করেছে। মায়ের সাথে এত দিন যে সম্পর্কসূত্র ছিল তা যেন ছিঁড়ে গেছে। ফলে মরজগতে সে ভয়াবহভাবে একাকী হয়ে পড়েছে। পরের দৃশ্যেই কমলকুমার অনিলার একাকিত্ববোধকে তুলে ধরেন —

এখানে যে কাঁদিতেছে, তাঁহার বেদনা নির্দ্ধারণ করা দুরূহ; তাহার রূপ ঐশ্বর্য্য নিখাদ দেহ, — শ্রীসম্পন্ন কান্তি, লক্ষ্মী সুস্থিরা শোভা, এ সকল সত্ত্বেও তাঁহাকে একাকিনী করিল। (কমলকুমার, ১৯৮৪ : ৮৭)

এ ঘটনার পর থেকে মায়ের সাথে তার সম্পর্কটি সংঘাতে রূপ নেয় এবং পিতৃক্ষুধা অস্বাভাবিক আকার ধারণ করে। সে মাকে তার বাবা হত্যাকারী হিসেবে চিহ্নিত করে। মাকে সে অভিযোগটি প্রকাশ্যে করে বসে এবং তার প্রতিক্রিয়াটিও হয় তীব্রভাবে —

অনিলা মহা আপশোষে মহা জ্বালায় মানসিক নির্য্যাতনে বলিয়া উঠিল "তুমি আমার বাবাকে মেরেছো" এ উক্তি সকালের রাস্তায় দাবদাহ সৃষ্টি করিল।
লাবণ্য দেবী আর সহ্য করিতে না পারিয়া প্রচণ্ড বিক্রমে অনিলাকে চপেটাঘাত করত নিজেই কাঁদিয়া ফেলিলেন। (কমলকুমার, ১৯৮৪ : ৮৯)

পিতৃক্ষুধার চূড়ান্ত পরিণতিতে খাবার গ্রহণে অনিয়ম ও ব্যক্তিত্ব গঠনে অসঙ্গতির (Disorder) যে কথা বলা হয়েছে আমরা এ পর্যায়ে অনিলার চরিত্রে তা পুরোপুরি প্রতিফলিত হতে দেখি। এ ঘটনার পর এমলিওয়ার্থ হোটেলে ফিরে গিয়ে অনিলা পুরোপুরি অসংলগ্ন আচরণ করেছে। সে খাবার গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, হোটেলের জিনিসপত্র ভাংচুর করেছে। আর মাকে তীব্র ভাষায় তার পিতাকে হত্যার অভিযোগ করেছে —

অনিলা মাকে একা পাইয়া ক্ষেপিয়া উঠিল, "জঘন্য স্ত্রীলোক তুমি মিসেস চ্যাটার্জ্জি না, আমার বাবারে অপমান করেছ, তুমি আমার বাবাকে মেরেছো, ডামনেবল হেবার," ... বলিয়া যাহা হাতের কাছে পাইল তাহাই ছুঁড়িতে লাগিল, পারফিউমের শিশি হইতে সকল কিছু- এইভাবে রুদ্রতার মাঝখানে নিজে বেচারী পড়িয়া যায়, তাহার হাত কাটিয়া গেল, এবং অচৈতন্য হয়-বাবা বাবা এ শব্দ বাহির হইল। কাঁচের টুকবার মধ্যে তাহার দেহ বীভৎস ভাবে পরিভ্রমণ করে। (কমলকুমার, ১৯৮৪ : ৯০)

অনিলা এ অবস্থায় তার পিতৃক্ষুধাকে খ্রিষ্টীয়ধর্মবোধ দ্বারা পূরণ করতে চেয়েছে। সে তার পিতৃপ্রতিমা (Father Icon) কে যিশু প্রতিমায় (Christ Icon) রূপান্তরিত করেছে। সে যিশুকে অবমাননা ও হত্যার অনুরূপ তার পিতাকে হত্যা ও অবমাননার চিত্র কল্পনা

করেছে। ইতোমধ্যে সে যেহেতু পিতাকে অলিকদর্শন (Hallucination) করতে শুরু করেছিল সেহেতু সে এটাকে তার নিজের মতো করে একটা যুক্তির মধ্যে আনে। তার মতে তার পিতা তার ঈশ্বর জগতে আবার আসতে শুরু করেছেন সে তাকে কেউ ভালবাসে কি না তা দেখার জন্য —

> কত প্রার্থনা সে জানিয়েছে তাহার বাবা এবং তিনি যিনি সকলের মধ্যে আছেন। এক ও অভিন্ন ভগবান তাহাকে ভালবাসেন কেননা তাঁহার পিতারূপে আসিয়া ছিলেন ; তিনি নিশ্চয়ই দেখিতে চান তাঁহার অবর্ত্তমানে সে ভালবাসে কি না?
>
> অনিলা আপনার স্নেহময় পিতার দুঃখ দুখখানি স্মরণ করিল, মনে হইল সমগ্র জগৎ তাহার অবমাননা করিবে জানিয়া পূর্ব্বেহেই তিনি চলিয়া গিয়াছেন, বেচারীর প্রতিটি রোমকূপ হাহা করিয়া উঠিল, প্রিয়দর্শিনী চারুদশনা অনিলা ক্রন্দন করিতে লাগিল, কেননা তাহার পিতাকে অতিমাত্রায় লাঞ্ছিত করা হইয়াছে এবং তাহার পৌরুষ আঘাত প্রাপ্ত, অনবরত রোমহর্ষ, সে, কেবলই বিষণ্নতা, বিমর্ষ, দুঃখ, অবসাদ, ক্ষোভকেই জানিল; ক্লৈব তাহাকে আছন্ন করিল। (কমলকুমার, ১৯৮৪ : ৮৭-৮৮)

অনিলা এই আছন্নদশায় হোটেল হতে তার পিতার মৃত্যুস্থান শাহানপুরে যাওয়ার জন্য উতলা হয়েছে। ফলে সে রাতেই তারা শাহানপুরে ফিরেছে। কিন্তু শাহানপুরে পৌঁছানোর পর নতুন বাস্তবতার সৃষ্টি হয়েছে। শাহানপুরে ফিরে অনিলা তার মায়ের সাথে কথাবার্তা বন্ধ করেছে। এ পর্যায়ে মাও মেয়েকে অবিশ্বাস করতে শুরু করেছেন। মেয়ে মাকে পানি এনে দিলে মা তা বিষ বলে দূরে ঠেলে দিয়েছেন। লাবণ্যদেবীর এ সংকট মুহূর্তে তার নতুন স্বামী রঞ্জিত চ্যাটার্জ্জি এসে উপস্থিত হয়েছেন। এতে ঘটনা নতুন মোড় নিয়েছে। অনিলা তার পিতার দুভার্গ্যের জন্য এখন আত্মনির্যাতন করতে শুরু করেছে। সে তার নিজের চুল কেটে ফেলেছে, গায়ে আত্মনিগৃহের দাগ তৈরি করেছে — "নিজেকে ছ্যাঁকা দিয়াছে, চুল ছাটিয়া ফেলিয়াছে, এখন বেচারী অশরীরী, কি বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন।" (কমলকুমার, ১৯৮৪ : ৯৪)

অনিলা সারাক্ষণ ইশ্বরকে ডেকেছে। সে তার পিতার হত্যাকারীর বিচার প্রার্থনা করেছে। এ অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য সে এক সময় নানা জায়গায় চিঠি লিখেছে —

> এই অভিশপ্ত গৃহ হইতে যাহাতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, তাহার জন্য যাহা যাহা করা উচিৎ এখানে সেখানে টেলিফোন, ভাইসরয়কে চিঠি, গভর্ণরকে চিঠি সবই, পিয়নকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে "আমার চিঠি আছে?" কিন্তু ফল হয় নাই, সে এখান হইতে পালাইতে চাহে ; আশ্চর্য্য! শুনিল সে নাবালিকা, এবং সে আইনকে উপহাস করিয়াছে, বলিয়াছে "বাঃ আমি পুত্রসন্তান সম্ভবা হইতে পারি কিন্তু.. ." (কমলকুমার, ১৯৮৪ : ৯৪)

শাহানপুর থেকে সে পালাতে পারেনি। কিন্তু একটি সংবাদ তাকে বাস্তবতা থেকে আবারো অলীকজগতের পথ দেখিয়েছে। বাড়ির ভৃত্যরা আলাপ করেছে যে তারা বড়বাবু তথা অনিলার বাবাকে এ বাড়ির ছাদে থেকে নামতে দেখেছে। এ খবরে তার পিতৃক্ষুধা পুনরায় জাগ্রত হয়। সে ছাদে যেতে থাকে। সেখানে গিয়ে বাবাকে আহবান করতে থাকে —

পরক্ষণেই উচ্ছ্বসিত হইয়া তাহাদের ডাকে; এবং সমস্ত কিছু শুনিয়া — সে অভিমানে কাঁদিতে লাগিল, এরা তাহার পিতাকে দেখে এবং পুনঃ পুনঃ বাবাকে স্মরণ করে।
মসৃণ, ধূম্র, চাঁদের আলো ছাদে, অনিলা এখানে, একবার ভাবিল এই ত সময়, পরক্ষণেই আমার বাবা বহুপথ অতিক্রমে আসছেন, তাই দেরী হইতেছে, পিতাকে দেখিতে আসার দুঃসাহসিকতায় সে রোমাঞ্চিত ...
... অনিলার আর ধৈর্য্য নাই, সে ক্রমশঃ বিকৃত, সে ছাদে সদর্পে এধার ওধার যায়, মাঝে মাঝে বালিকা- কণ্ঠে ডাকিয়া উঠে "বাবা বাবা তুমি এসো।" (কমলকুমার, ১৯৮৪ : ৯৫)

অনিলার বাবা গঙ্গাকিশোর সত্যি একদিন আসেন —

... চক্ষু মেলিয়া চাহিল, দেখিল, 'গঙ্গাকিশোর।'
"বাবা বাবা" বলিয়া কুমারী, নাবালিকা, পিতা যাহার ধর্ম্ম, পবিত্র, নিষ্পাপ অনিলা প্রায় এক লম্ফে মানুষটির কাছে আসিয়া জড়াইয়া, কখন কখন ক্রন্দন, কখন দংশন, কখন আপনার নখর আঘাতে সকল কিছু প্রকাশে আপনার শ্বাসরুদ্ধ হয়, কর্ত্তিত লতার ন্যায় অবশেষে নতজানু হইয়া বসিয়া, শব্দ উচ্চারিত না করিয়া অনেক কথাই বলিয়াছে ; এবং তাহার পদদ্বয়ে হেলান দিয়া, মনের কথা ব্যক্ত করিয়াছে।
... সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে অনিলা মন্ত্র চালিতের মত বলিতেছিল ''যিনি এত দিন স্বর্গে ছিলেন তিনি আজ এসেছেন, তিনি আমার ... বাবা ... যিনি রুকমি আলো জ্বালাও আমার বাবা এসেছে... (কমলকুমার, ১৯৮৪: ৯৬)

কিন্তু লাবণ্য দেবী আবিষ্কার করলেন, অনিলা তার যে পিতাকে স্বর্গ থেকে এসেছেন বলে নিয়ে এসেছে সে আসলে রঞ্জিত — লাবণ্য দেবীর নতুন স্বামী। পার্থক্য হচ্ছে মানুষটি রঞ্জিত হলেও সে সকল আচরণ করছে ও কথাবার্তা বলছে মৃত গঙ্গাকিশোরের মতো। বাড়ির বিহারীবাবু লাবণ্য দেবীকে বুঝিয়ে বললেন, এটা গঙ্গাকিশোরের আত্মা। রঞ্জিত চ্যাটার্জ্জির উপর ভর করেছে। একে তাড়াতে হবে। না হলে ধীরে ধীরে রঞ্জিত চ্যাটার্জ্জি মারা পড়বে। লাবণ্য দেবী বলেছেন এটা কুসংস্কার। কিন্তু ডাক্তাররা তাকে কোনো ভাল সমাধান দিতে পারেননি। ফলে লাবণ্য দেবীর নির্দেশে আত্মাতাড়ান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এ আচারটি যখন শিকারবাড়ীতে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল অনিলা তা জানতো না। জানার পর সে যখন সে অনুষ্ঠান স্থলে উপস্থিত হয়েছে তখন তার চোখে দেখা পিতার দুর্দশার চিত্র —

তাহার বাবাকে লণ্ঠনের আলোয় দেখা যায়, তিনি দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার দুঃখময় মুখখানি প্রতীয়মান। একটি লোক ঘুরিয়া ঘুরিয়া কি যেন প্রক্রিয়া করিতেছে, তাহার পিতা বলিয়া উঠিলেন "না যাব না... আমি অনিলাকে বড় ভালবাসি... ।"
"যেতেই হবে বলিয়া ভৌতিক লোকটি আঘাত করিল।"
"আমি অনিলাকে বড় ভালবাসি"
অনিলা স্তম্ভিত। সে "বাবা" বলিয়া ডাকিতে চেষ্টা করিল মাত্র।
"আচ্ছা যাচ্ছি" বলিয়া গঙ্গাকিশোর আর্ত্তনাদ করিল।
"কি করে গেছিস বুঝব? ডাল না শিল? জুতা মুখে ত করতে পারবি"।
"পারব পারব"। (কমলকুমার, ১৯৮৪: ১০১-১০২)

অনিলার জন্য এ দৃশ্য অসহনীয় হয়ে উঠল যখন সে দেখল তার পিতা যিনি তার কাছে ভগবান — মুখে মায়ের জুতা নিয়ে যাচ্ছেন। সে আত্মনিগ্রহে গুলি ছুড়িল ও মাটিতে লুটিয়ে পড়ল—

> অনিলা দেখিল, গঙ্গাকিশোর তাহার মা লাবণ্যদেবীর নাগরা মুখে করিয়া লইয়া যাইতেছে। সে বেদনায় বাবা বলিয়া উঠিয়া সজোরে ঘোড়াকে পদাঘাত করিল। ঘোড়ার উপরেই অনিলা গুলি ছুঁড়িল।
> তের খাইয়ের সোঁতার মাথায় আসিয়া ঘোড়া থামিতেই অনিলার দেহটি মাটিতে লুটাইয়া পড়ে। (কমলকুমার, ১৯৮৪ : ১০২)

৩

উপন্যাসটির পাঠ শেষে এ প্রবন্ধের প্রান্তে দাঁড়িয়ে একটি কিশোরীর পিতৃক্ষুধার বিয়োগান্তক এ রচনাটি আমাদের কাছে দুটি প্রশ্নের মীমাংসা দাবি করে। প্রথমত একজন আধুনিক মননের মানুষ উপন্যাসে উনিশ শতকের এমনি একটি কুসংস্কার-তন্ত্র-মন্ত্র ভূত দিয়ে একটি পিতা অন্তপ্রাণ কন্যার পিতৃক্ষুধার মর্মান্তিক পরিণতি আঁকতে গেলেন কেন? দ্বিতীয়ত, কমলকুমার-এর এই বাৎসল্যরসের ফ্যান্টাসির উৎস কী?

উপন্যাসটির সময়কাল উনিশ শতক। উনিশশতকের হিন্দু সমাজ ব্যবস্থায় একটি কিশোরীর পিতৃক্ষুধার মানসিক বিকলনের এর চাইতে হয়ত আর ভাল ব্যবস্থা তার হাতে শাহানপুরে ছিল না। শাহানপুরে রঞ্জিতের মনোবিকলনের চিকিৎসায় ডাক্তারদের অপারগতার কথাটিও আমরা জানতে পেরেছি। এটা উপন্যাসটির অভ্যন্তরীণ যুক্তির কথা। কিন্তু এতে আমরা ঠিক সন্তুষ্ট হতে পারি না। বইটির ভূমিকায় দয়াময়ী মজুমদার উদ্ধৃত করে লিখেছেন—

> ... অতি আধুনিক বুর্জোয়াভাবাপন্ন বর্ত্তমানতার সঙ্গে, লেখক তাঁর সৃজনশীল স্বাভাবিকতায়-পুরাতন এক প্রাকৃত দৃষ্টিভঙ্গির সহজ সামঞ্জস্যের খুব অনায়াস সমঝোতা করেছেন এবং তুলে ধরেছেন রচনার প্রামাণ্যচিত্রটি...

দয়াময়ীর উদ্ধৃতিতে 'সৃজনশীল স্বাভাবিকতা' এবং 'প্রাকৃত দৃষ্টিভঙ্গির সহজ সামঞ্জস্যের খুব অনায়াস সমঝোতা' পদবন্ধদ্বয় আমাদের আকৃষ্ট করে। উপন্যাসটি পাঠ করার পর অনিলার পিতৃক্ষুধার সামনে আমরা বিহ্বল হয়ে পড়ি। তখন আমাদের কাছে তার সর্বতোব্যাপী বেদনাটিই বড় হয়ে ওঠে আর ঘটনাসংস্থানকে স্বাভাবিকই মনে হয়। এ শিল্পকর্মটির সাফল্য এইখানেই।

অনিলার এই সর্বতোপ্লাবী পিতৃক্ষুধার সামনে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় যে প্রশ্ন জাগে তা হল, কমলকুমার কেন এমন বাৎসল্যরসের রচনাটি লিখতে গেলেন। এ প্রবন্ধের ভূমিকাংশে যেমন উল্লেখ করেছি কমলকুমারের অনেকগুলো রচনায় এ থীম বার বার ঘুরে ফিরে এসেছে। এর কারণ প্রসঙ্গে আমরা ভূমিকাংশে একটি অনুসিদ্ধান্তও (Hypothesis) পেশ করেছিলাম। ঔপন্যাসিক ছিলেন পুত্রকন্যাহীন। সন্তানক্ষুধা তার মধ্যে তীব্র হয়েছিল। আমরা প্রবন্ধের শুরুতেই উল্লেখ করেছি তিনি তরুণতর কবিদের মধ্যেই খুজে বেড়িয়েছেন সন্তানের মুখ। এ তালিকায় সুব্রত রুদ্র, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, সুবর্ণরেখার কর্ণধার ইন্দ্রনাথ মজুমদার, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় থেকে শুভ মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত অনেক তরুণ কবিই আছেন। দয়াময়ীও কমলকুমারের এ সন্তান বাৎসল্যকে মেনে নিয়েছেন। পরবর্তী সময়ে নানা লেখায় এদের

সন্তানতুল্য হিসেবেই উল্লেখ করেছেন। কমলকুমার বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থকে এঁদের নামে উৎসর্গ করেছেন। লিখেছেন স্নেহের শুভকে। *অনিলা স্মরণে* উপন্যাসটির উৎসর্গপত্রে লিখেছেন 'স্নেহের প্রণববসু রায়কে'। ব্যক্তিগতভাবে এ প্রবন্ধের লেখককে দয়াময়ী পুত্র বলে গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ এ দম্পতির সন্তানক্ষুধার নানা রূপের প্রকাশ রয়েছে। কমলকুমার এ উপন্যাসটিতে অনিলার পিতৃক্ষুধাকে একটি ফ্যান্টাসী পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। এর মাধ্যমে তিনি মূলত তার নিজ সন্তানক্ষুধাকেই রূপায়িত করেছেন। ফলে উপন্যাসটিতে একই সাথে অনিলা ও লেখকের বাৎসল্যরসের তৃষ্ণার্ত কণ্ঠস্বরকে আমরা ঐকতানে মিলতে দেখেছি। এতে উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে একটি বহুস্বরিক (Polyphonic) শিল্পসফল সৃষ্টিকর্ম।

টীকা

১. পিতৃক্ষুধা (Father hunger) তত্ত্বটি এসেছে খাদ্যরোগ চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান থেকে। ২০০৪ সালে ড. মারগো মাইনের Father Hunger: Fathers, Daughters, and the Pursuit of Thinness গবেষণাগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে দেখানো হয় অনুপস্থিত পিতা (Absent father) কন্যাশিশুর আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে এমনকী খাদ্যগ্রহণ অভ্যাসকে পরিবর্তন করে দেয়। পিতার অনুপস্থিতি কন্যাশিশুর খাদ্যগ্রহণকে অনিয়মিত করে দেয় যা তার শারীরিক বেড়ে ওঠা ও মানসিক গঠনকে প্রভাবিত করে। এর আগে পিতা-কন্যার সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করা হত জিগমুন্ড ফ্রয়েডের যৌন আচরণসূত্রের অনুষঙ্গে। তাঁর শিষ্য গুস্তাভ ইয়্যুঙ বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন যৌথ অবচেতনা (Collective unconsusness) জাত ট্যাবুর (Taboo) সাথে। কমলকুমারের সমকাল এ অভিজ্ঞানজগতে আবর্তিত ছিল। কিন্তু কমলকুমারের চেতনা এ থেকে পৃথক ছিল যা বরং সাম্প্রতিক চিন্তার সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ।

২. বলা হয়ে থাকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জগৎপিতা আহত হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তিনি নিহত হন। এ প্রেক্ষিতেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সাহিত্যে প্রতিফলিত হয় পিতাবিহীন (ঈশ্বর) মানুষের হাহাকার। রোলাঁ বার্ত ১৯৬৭ সালে তাঁর 'The Death of the Author' রচনায় সাহিত্যে লেখকের মৃত্যু ঘোষণা করেন। তাঁর মতে সাহিত্যপাঠ লেখক নিরপেক্ষ। ফলে এ বিগত শতাব্দে বহু অর্থেই পিতার ধারণার মৃত্যু ঘটে।

গ্রন্থ ও প্রবন্ধপঞ্জি

কমলকুমার মজুমদার (১৯৮৪)। *অনিলা স্মরণে*, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, কলিকাতা।

কমলকুমার মজুমদার (১৯৯৭)। *সাহিত্যিক কমলকুমার মজুমদারের সাথে কথাবার্তা। উত্তরাধিকার* (অমিত দাস ও অনিরুদ্ধ ভৌমিক সম্পাদিত)। কলকাতা, কমলকুমার মজুমদার সংখ্যা।

শোয়াইব জিবরান (২০০৯)। *কমলকুমার মজুমদারের উপন্যাসের করণকৌশল*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

হিরণ্ময় গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৯০)। *কমলকুমার মজুমদার জীবন ও শিল্প* (অপ্রকাশিত গবেষণাপত্র), বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত।

Haley Kranstuber Horstman (2012), *Changes in narrative sense-making over time: The role of mother-daughter communication during conversations about difficulty*, University of Nebraska-Lincoln, US.

Marianee, Hirsch (1981). Mother and Daughters, the University of Chaicago Press, US.

Margo. Maine (2004). *Father Hunger : Fathers, Daughters, and the Pursuit of Thinness*, Gurze books, US.